দেবদাসের জন্য

কবিতার বদলে কবিতা

অর্থাৎ স্মৃতির মধ্যে

মৃত্যু কি সকলই নেয়? মৃত্যু কি সকলই নিতে পারে?
তাহলে কী নিয়ে থাকে, যাদের নেয়নি মৃত্যু, তারা?
আসলে যে যায়, সেও সমগ্রত যায় না ও-ধারে,
লুকিয়ে থেকেও তবু বন্ধুদের দিয়ে যায় সাড়া।
তখনও সে ভালবাসে; মনে রাখে, কাছে ছিল কারা;
নির্জন মুহূর্তে এসে চিত্তের দুয়ারে কড়া নাড়ে।
সহসা শ্রবণে ঝরে তারই অমলিন হাস্যধারা।
অর্থাৎ স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থেকে মৃত্যুকে সে মারে।

ফলত

প্রথম দিন তোমাকে আমি দূরের থেকে দেখি,
দ্বিতীয় দিন চিবুক ধরে কাছের থেকে দেখা,
তৃতীয় দিনে বন্ধুরাই জানিয়ে দিল কে কী
বলেছে, আমি ফলত আজও একা।

কিন্তু যে যা বলুক, তাতে শরীরে কেন ছ্যাঁকা
লাগে হে, বাপু, সূচনা থেকে যাবে না অন্তে কি
যাবে না জানি, কেননা সূচনাটাই ছিল ন্যাকা,
ফলত বাদবাকীটা ছিল মেকী।

বিরহ, এবং

জলের খানিক নীচে রয়েছে শৈবাল,
সামান্য ঝুঁকলেই দেখা যায়,
কিন্তু সে দেখে না, তার দৃষ্টিকে সে লাল
গোলাপের সন্ধানে পাঠায়।
আমি দেখি, উদয়াস্ত আমি দেখি তাকে,
বিরহ-ভাবনার মতো নিরন্তর দুলে যেতে থাকে
জলজ শৈবাল।

॥ ২ ॥

মর্মমূলে বিঁধে আছে পঞ্চমুখী তীর,
তার নাম ভালবাসা।
কেটেছে গোক্ষুরে যেন, নীল হয়ে গিয়েছে শরীর,
তার নাম ভালবাসা।
ঠাকুমা বলতেন, ওই সূর্যটাকে ছিঁড়ে
এনে যে লণ্ঠন জ্বালে দুঃখীর কুটিরে
তার নাম ভালবাসা।

হতাশা, এবং

বুকের রক্ত এক সময়ে শুকায়,
সপ্ত ঋষি সহসা মুখ লুকায়
কৃষ্ণবর্ণ মেঘে।
রোগীর ঘরের খানিকটা যায় দেখা,
হাসপাতালের মাঠের মধ্যে একা
লোকটা আছে জেগে।

॥ ২ ॥

তিনি বলেছেন, আলো জেলে রেখো,
তিনি বলেছেন, দরজায়
এই দুর্যোগে কিছুতেই খিল দিও না।
জানি না, সে এসে ডাক দেবে কি না, যখন তুফান গর্জায়
তিনি বলেছেন, কী জানি, আশার সুবাস কিন্তু মেখো,
আজকে রাত্রে দাঁতে নিমপাতা নিও না।

চলো

আমি কি সমস্ত দিন ঘুমিয়ে ছিলাম ?
আমি কি বিস্তর পথ ঘুরে
সমুদ্রবেলায় গিয়ে দাঁড়াইনি ? গ্রীষ্মের দুপুরে
ঝরাইনি ঘাম ?
আমি কি ময়লা ও ধুলো একটুও মাখিনি ?

চুপ করো, খুলো না মুখ, উত্তর চাই না, আমি চিনি
কে বন্ধু কে শত্রু। আমি জিজ্ঞাসার ছলে
সত্যকথা বলেছি, তা ছাড়া
অভিজ্ঞতা বলে,
তোমরা প্রায়ই উলটো-ঠিকানায় কড়া নাড়ো,
নির্ভয়ে ঘুমোয় তাই বাবু ও বাছারা।

অনুগ্রহ করে পথ ছাড়ো।
কিংবা চলো, সবাই একবার যাই সমুদ্রবেলায়
দল বেঁধে, যেরকম তীর্থে হয় যাওয়া।
সকলের ঘুম ভাঙাই, ক্ষান্তি দিয়ে নির্বোধ খেলায়,
চলো যাই, সর্বাঙ্গে লাগাই ঝোড়ো হাওয়া।

জল তবুও

যত গর্জে, তত বর্ষে না।
দুমদাম বোমা ফাটিয়ে
বৃষ্টি এখন পালাচ্ছে।
চারদিক থেকে
নিঃশব্দে ছুটে আসছে রোদ্দুর।

আকাশ এখন ঝলমল করছে।
দিনগুলো এখন
নিকিয়ে-নেওয়া উঠোনের মতো টান্‌টান্‌।

এখানে-ওখানে জমে-থাকা জল তবুও শুকোয় না
চোখের কোল বেয়ে
জল তবুও গড়াতেই থাকে,
গড়াতেই থাকে।

ঠিক তখনই

কেউ যখন কোনও কথা বলে না,
নদীর জলে ঢেউ ওঠে না,
এবং গাছপালাও নিঃশব্দ,
ঠিক তখনই আমার
রক্তের মধ্যে দোলা লাগে।

ঠিক তখনই আমার মনে হয় যে,
এই স্তব্ধতা আসলে
বিশাল কোনও বিপর্যয়ের প্রস্তুতি।

মনে হয়,
একটু বাদেই ঝড় উঠবে,
একটু বাদেই সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়বে
কাড়া-নাকাড়ার শব্দ।

মনে হয়, নিশ্বাস গোপন করে
পৃথিবী এখন
তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

কাছে থাকো

দূরে গেলে দূরে থাকা হয়,
কাছে এলে কাছে।
হারিয়েছি অনেক সময়,
এখন যেটুকু বাকী আছে,
সেইটুকু কাছে-কাছে থাকি,
হাতের উপরে হাত রাখি,
কাছে থেকে মুছে দিতে চাই
না-থাকার ভয়।
যেন বুঝি, দূরে থাকাটাই
তোমার-আমার পরাজয়।

যেন বুঝি, যে বলেছে, যাই,
আসলে সে বলেনি কিছুই।
ঘরে তার বাজেনি সানাই,
উঠোনে ফোটেনি তার জুঁই।
তাহলে যেও না আর দূরে,
তাহলে সকল বুক জুড়ে
থাকো তুমি, চিরকাল থাকো,
ভেঙে দাও ভুল।
হৃদয়ে সুরের ছবি আঁকো,
উঠোনে ফোটাও কিছু ফুল।

শ্যামবাজারে

"আমরা নেহাত নখের ময়লা, আমরা নেহাত পায়ের ধুলো,"
বলতে বলতে ছেলেগুলো
মিলিয়ে গেল গলির মধ্যে অন্ধকারে,
শ্যামবাজারে।

কোথাও তো গাছপালা নেই, তাই বুঝি না
পত্রালি তার নড়ত কি না
আজ এই রাত্রে। পথের বাঁকে
লক্ষ লক্ষ ঘামের বিন্দু ফুটতে থাকে।

"ঘামের বিন্দু, তাকেই কিনা মানুষ বলে ভুল করেছে,"
পাগল বলে, "এই মরেছে!
ধুত্তোরি ছাই, বৃথাই তোমরা দ্বন্দ্ব করো;
দোকানী, ঝাঁপ বন্ধ করো।"

ছোটো দুটি

তোমরা আমার মাথায় ছিলে, তোমরা আমার বুকে,
তোমরা আমার দুঃখে এবং সুখে।
এই কথাটা বলব বলেই এতটা পথ এসেছিলাম ;
অষ্টপ্রহর ঝগড়া করেও দারুণ ভালবেসেছিলাম।

॥ ২ ॥

আলগা করে রাখি আঙুল আঁকড়ে ধরে রাখার জন্যে
ধুলোর মতো হীরে এবং মাটির মতো সোনা।
অনেক দূরে ঘুরে বেড়াই অনেক কাছে থাকার জন্যে,
এইটে যদি বুঝতে, কোনো সমস্যা থাকত না।

বন্ধুর স্মরণে

ওকে বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছে, ওকে আজ
শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দাও,
ওকে পট্টবসনে সাজাও ;
ওকে বলো, এইখানে সমাপ্ত ওর কাজ,
ও এখন যেতে পারে।

ও যাবে কোথায়, কার উদ্যানের ঝাড়ে
ওর জন্যে ফুটেছে গোলাপ ?

এর মধ্যে উঠল কেন গোলাপের কথা ?
ও খুব ভালই জানে, কারও
উদ্যানে গোলাপ নেই, আছে তার ধারণা কেবল ;
আছে মাটি, আছে রৌদ্র, এবং আঁজলায় কিছু জল
তাহলে ছলনা ছাড়ো,
ওকে যেতে দাও।

ও যাবে কোথায় ? ও কি সত্যিই কোথাও
যেতে চায় ?

হায়,
তুমিও জানো না কিছু ? সর্ব অভিশাপ
থেকে ও বিমুক্ত আজ, তাই বিশ্বজোড়া
সাম্রাজ্য এখন ওকে ডাকে।
ওই দ্যাখো, সূর্য ওরই প্রশস্তি রচনা করে রাখে,
সমুদ্রের তরঙ্গে পা ঠোকে ওর ঘোড়া।

অন্নদাস

ভাঙো হাঁটু, দাঁতের ভিতরে ধরো ঘাস,
অন্নদাস,
এই তোমার খুলেছে চেহারা।

কারা
ঢাক-পিটিয়ে ঢাক-পিটিয়ে ঢাক-পিটিয়ে•জঙ্গলের ভূমি
কাঁপাচ্ছে দুপুরে, তুমি
জানো।

আসলে ব্যাপারটা খুবই চমৎকার কৌশলে সাজানো
কাঁটা
দিয়ে কাঁটা তুলবার খেলাটা
কে না জানে ?

হাতিও হাতিকে টেনে আনে।
অন্নদাস,
ভাঙো হাঁটু, দাঁতের ভিতরে ধরো ঘাস।

নির্বাচিত ভালবাসা

যতক্ষণ শ্বাস টানছি, ততক্ষণ আশা কি থাকেই ?
না থাক, তখনও চিত্তে বেঁচেবর্তে থাকে
আত্মমুখী কিছু ভালবাসা।
সেই কারণে কিছু-কিছু নির্বাচনও থেকে যায়।
যা আছে এইটের মধ্যে, ওটায় তা নেই,
থাকলেও ততটা নেই সম্ভবত, যতটা আমাকে
নিরুপাধি ফাল্গুনরাত্রির জানালায়
টেনে নিয়েছিল, এই তারতম্যবোধের তামাশা
তখনও ভাবনায় জমে ওঠে।

গুলঞ্চের ঠোঁটে,
নারীর শরীরে, রৌদ্রে, শস্যের বিনম্র ভঙ্গিমায়
গাত্র-হরিদ্রার একটু রেশ
থেকে যায় তখনও, মাঘের শেষে পাখি
খড়কুটো কুড়িয়ে এনে গৃহস্থের ঝঞ্ঝাট বাড়ায়।
অর্থাৎ তখনও ডাকাডাকি
চলতে থাকে, নির্বাচনী অভিপ্রায় নেভে না কোথাও।

কে যেন বুকের মধ্যে বলে ওঠে : যাও।
শুনে খুব ঠাট্টা করতে লোভ হয়, তরল গলায়
বলি, "যাব, কিন্তু তার আগে
প্রকৃতি ও মানুষের এই ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে
পর্যটন অসমাপ্ত রেখে যাওয়া ভাল ?
দৃষ্টিতে জ্বালিয়ে রাখি আলো,
কোথায় রয়েছে ন্যস্ত ভালবাসা, কার তীক্ষ্ণ তীরের ফলায়,
স্পষ্ট করে জেনে যেতে চাই।"

বলে নেমে যাই
ঘর থেকে উঠোনে, দেখি, ধুলোর মধ্যেও
যত্ন করে কে রাখে সাজিয়ে
কিছু প্রাণ, অর্থাৎ কিছু-বা কেন্নো, কিছু-বা টগর, কিছু হেনা।
কেউ রাখে।
সবকিছু অধ্রুব জেনে, তবুও সে মৃদঙ্গ বাজিয়ে
দিগন্তের দিকে চলে যায়।
এই তাহলে নির্বাচন! এরই জন্যে নিরুদ্ধার বেদনায়
মৃত্যুকে যে বেছে নেয়, সেও
সহসা শীতের রাত্রে জলে ডুবে কোথাও মরে না।

থাকে, তারও অন্যবিধ নির্বাচন থাকে।

কালপুরুষের চিত্র

কাউকে ট্রেনে তুলে দিয়ে অন্ধকার ঘরে ফিরে আসবার যন্ত্রণা
জেনেছ তুমিও।
অথচ বোঝোনি, যার যাওয়া, তার ও অন্ধকারে যাওয়া।
যত সে এগোয়, তত উলটো-দিকে হাওয়া
ছুটে যায়,
তত তার কামরার ভিতরে স্তব্ধ রাত
নেমে আসে।
বুকের ভিতরে পোড়ে শুকনো পাতা, খোলা জানালায়
কালপুরুষের চিত্র ভাসে।

বস্তুত আদ্যন্ত মিথ্যে

"নাহক ভয়ে কাঁপবেন না।
ভয় তো শুধুই বাচ্চা একটা ছেলের জন্যে?
আত্মজনে রাগলেই বা,
মুখ ফিরিয়ে থাকলেই বা,
বানভাসিতে মরবে না ও, দেখবে অন্যে।
অন্যে মানে আমরা; এবং আমরা আছি
কাছাকাছি।
আমরা দেখব, আপনি ভাবনাবিহীন চিত্তে
যান।
ভাববেন না, ভাববেন না, ভাববেন না।"

প্রতিশ্রুতি যাঁর, দেখেননি তিনি কিছু,
তিনি শুধুই কথার পরে বসিয়ে কথা
দায়িত্বশীল সরলতার
সুশ্রী-কিন্তু-বস্তুত-আদ্যন্ত-মিথ্যে
একটি চিত্র এঁকেছিলেন।

আঁকুন। কিন্তু স্বীকার্য যে, তিনিই পিছু-
টান
কাটিয়ে দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার
ঝাপট লাগা রাতে
যাত্রালগ্নে-দ্বিধান্বিত দুঃখী একটি লোকের হাতে
তার পাথেয় রেখেছিলেন।

বস্তুত এই মিথ্যেগুলিই সহজ করছে যাওয়া।

কবি

কবি, তুমি গন্ডের সভায় যেতে চাও ?
যাও।
পা যেন টলে না, চোখে সবকিছুকে-তুচ্ছ-করে-দেওয়া
কিছুটা ঔদাস্য যেন থাকে।
যেন লোকে বলে,
সভাস্থলে
আসবার ছিল না কথা, তবুও সম্রাট এসেছেন।

ঘোড়া

"কাল থেকে ঠিক পালটে যাব
দেখে রাখিস তোরা,"
বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ল অশ্বমেধের ঘোড়া
পথের মধ্যিখানে।

ভেবেছিলুম, যে দিকে যাই, জ্বালতে-জ্বালতে যাব
শহর-গঞ্জ কারখানা-কল, কিন্তু এখন প্রাণে
অন্যরকম ভুজুং দিচ্ছে অন্যরকম হাওয়া।

"এই নে, তোকে দিলুম বাড়ি, নতুন খড়ে ছাওয়া,
দিলুম আগরতলার শীতলপাটি।
কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধ দিলুম, বড্ডরকম মিঠে,
এবং সোঁদরবনের মধু, চোদ্দ-আনা খাঁটি।"

শুনেই আমি চমকে উঠি, পথের শক্ত ইঁটে
লাথি কষাই, হাওয়ার মধ্যে কোড়া
ঘুরিয়ে বলি, "আয় রে আমার অশ্বমেধের ঘোড়া ;
আয়, যে রকম কথা ছিল, তেমনি করে বাঁচি।"

তেমনি করে কেউ বাঁচে না, নেই-কুসুমের তোড়া
কেউ বাঁধে না, কোত্থেকে জল কোথায় চলে যাচ্ছে
নজর করলে দেখতে পাবি, রক্ত শুষে খাচ্ছে
অশ্বমেধের ঘোড়ার পিঠে রাক্ষুসে এক মাছি।

যেমন ছিল

নেই, তবু সে আছে,
এবং থেকেও নেই,
যেমন তুমি, নারী।
যেমন তোমার শাড়ি
জড়িয়ে ছিল এই
মগ্ন গোলাপগাছে।

গোপন ছিল ভাষায়
যেমন যাওয়া-আসা,
যেমন ভালবাসা।

যেমন ছিল ধুলোর
মধ্যে গোলাপ-চারা,
কিন্তু ঢাকা ছিল।
যেমন ফাঁকা ছিল
এই গেরস্তপাড়ার
ঘরবারান্দাগুলো।

রৌদ্রের ভিতরে ওই

রৌদ্রের ভিতরে ওই ছুটে যায় চিত্রল হরিণ ;
জলের দর্পণে ওই ভাসে
অশ্বত্থের ছায়া।
ওই কৃষ্ণ-রমণীর বিধুর চক্ষুর মেঘমায়া
জেগে আছে অনন্ত আকাশে।

সমস্ত প্রান্তর ব্যেপে উজ্জ্বল দুপুর সমাসীন।
কিন্তু শশীকলা ছিল ঝুঁকে
কাল শেষরাত্রে কোনো দুঃখী প্রাসাদের ঝরোকায়।
এইখানে কেউ গতকল্য নিশাবসানে কাউকে
দিয়েছে বিদায়।

তারই স্মৃতি চক্ষু দিয়ে শুষে নেয় ঘরবাড়ি-খামার,
তারই দুঃখে জলের ভিতরে পড়ে ছায়া
অশ্বত্থের। ওই দ্যাখো, রৌদ্রের ভিতরে জাগে তার
বিধুর চক্ষুর মেঘমায়া।

না সূর্য, না চন্দ্রতারা

একে-একে মুঠিগুলি বন্ধ হয়ে আসে চারিদিকে,
আলোগুলি নিভে যায়।
না-সূর্য কেটেছে দিন ; না-চন্দ্রতারকা তমসায়
কাটে রাত।
এ তোমরা কোথায় গিয়ে কার কাছে শিখে
এসেছ এমন কৃপণতা
যা গিয়ে মূর্খের মতো ধনুর ছিলায় রাখে দাঁত,
যা কাউকে জানাতে দেয় না কোনো কথা ?

মুঠিগুলি বন্ধ হয়, চতুর্দিকে নিভে যায় আলো।
মানুষ-গাছপালা-বাড়ি সারে-সারে
না-সূর্যতারকাচন্দ্র নিঃশব্দ আঁধারে
দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ কী কৃপণের মতন সংসার
সাজিয়েছ ? জীবনে ও না-জীবনে সামান্য আড়ালও
নেই আর। কিছু নেই আর।

হাসে না শিশুও, পাখি ডাকে না, ডাকলেও কেউ সাড়া
না-দিয়ে তাকায় ধূম্রমলিন আকাশে ;
আলোগুলি নিভে যায়, মুঠিগুলি বন্ধ হয়ে আসে,
আঙুলে গলে না জলধারা।

মনের মধ্যে

বাইরের আগুন যখন
একটার-পর-একটা নিভে যেতে থাকে,
তখন
মনের মধ্যে
আগুন জ্বেলে নিও,
তা নইলে এই শীত কিছুতেই কাটবে না।

গত বছরে এই কথাটা যিনি বলেছিলেন,
তিনি এখন নেই।

এখন শ্রাবণ মাস,
মেঘে-মেঘে আকাশটা অন্ধকার হয়ে আছে
কিন্তু আর-কেউ না-জানুক,
তিনি জানেন যে,
আমার মনের মধ্যে এখনও ঝলমল করছে
এক-আকাশ রোদ্দুর।

শ্রাবণ, ১৩. ২

কবিতার বদলে

এইগুলি কবিতা নয়, গেরস্থালি চুকিয়ে পাহাড়ী
পথে হাঁটা নয়, কিংবা হঠাৎ রাগ করে
অন্তরালে সরে যাওয়া, তাও নয়। এইগুলিও চেনা পথে বাড়ি
ফিরে যাবে।

অথচ সবাই জানি, দিবা-দ্বিপ্রহরে
'বাড়ি যাব' বলতেই দূরের
বেদনা কিছু-না-কিছু আভাসিত হয়;
মনে হয়, স্মৃতির নেপথ্যবর্তী কোনো দুপুরের
রৌদ্রময়
আকাশে হঠাৎ কোনো নিঃসঙ্গ সম্রাট-চিল ডেকে উঠল। তুমি
জানো যে, তা নয়, রৌদ্রে ভেসে যাওয়া নয়, যেতে যেতে
ডেকে ওঠা নয়, পক্ক গোধূমের খেতে
নির্লিপ্ত হাওয়ার ঘোরাফেরা নয়, দগ্ধ বনভূমি
থেকে উঠে আসা শুকনো দীর্ঘশ্বাস—তাও নয়। এইগুলি আসলে
কবিতাসদৃশ কিছু কথা।

সূক্ষ্ম কি জটিল নয়, বরং বিমূর্ত সরলতা—
এইগুলি কবিতা নয়, যুদ্ধ কি মীমাংসা নয়, খেলা
ভেঙে দিয়ে চলে যাওয়া নয়।
কোনো ছলে
কিছু চাওয়া নয়, কিংবা কোনো-কিছু ফিরে পাওয়া নয়,
সন্ধ্যাবেলা
অস্ত-দিবসের পিছু-পিছু
চলা নয়, কাউকে কিছু বলা নয়, এইগুলি কবিতা নয়—অন্য কিছু।

এইগুলি কবিতা নয়। কথা। কিংবা তাও নয়। জানালায় উঁকি
দেওয়া। দিয়ে, বুঝে নেওয়া কার জন্যে কে কতটা ঝুঁকি

নিতে চায়।

এইগুলি কবিতা নয়, হাওয়া

ঘুরছে কিনা, সেইটে জেনে নেবার জন্যেই ঘুড়ি আকাশে ওড়ানো।

তুমি জানো,

এইগুলি কবিতা নয়, অন্ধকারে শুধু কিছু স্বপ্ন এঁকে যাওয়া।

কিংবা ঐতিহাসিক-বন্ধুটি হয়তো ঠিকই বলেছেন, ফের

দরকার বুঝলেই ফিরে আসব, এই স্থির বিশ্বাসের

শক্তি বুকে নিয়ে

কিছু উচ্চারণ ধরে রাখা।

এইগুলি কবিতা নয়, জলের ভিতরে দড়ি ছাড়তে-ছাড়তে দূরে সরে গিয়ে

নিশ্চিত বিশ্বাসে ভেসে থাকা।

ও পাখি!

ও পাখি, তুই কেমন আছিস, ভালো কি?
এই তোমাদের জিজ্ঞাসাটাই মস্ত একটা চালাকি।
শূন্যে যখন মন্ত্রপড়া অস্ত্র হানো,
তখন তোমরা ভালই জানো,
আকাশটাকে-লোপাট-করা দারুণ দুর্বিপাকে
পাখি কেমন থাকে।

কিন্তু তোমরা সত্যি-সত্যি চালাক কি? তাও নও।
নইলে বুঝতে, এই ব্যাপারটা বস্তুত দুর্বহ
যেমন আমার, তেমনি তোমার পক্ষে,
নীল জলন্ত অনাদ্যন্ত আকাশকে তার সখ্যে
বাঁধতে যে চায়, সে কি পাখি, সে কি শুধুই পাখি?
খাঁচায় বসে এই কথাটাই ভাবতে থাকি।

অন্যদিকে, তুমিও জানো, সত্যি-অর্থে বাঁচার
বিঘ্ন ঘটায়, তৈরী হয়নি এমন কোনো খাঁচা।
দুই নয়নের অতিরিক্ত একটি যদি নয়ন জ্বালো,
তবেই বুঝবে, এই না-ভালোর অন্ধকারেও আছি ভালো
বুঝবে, সে কোন্ মন্ত্রে নিজের চিত্তটাকে মুক্ত রাখি,
মৃত্তিকাকে মেঘের সঙ্গে যুক্ত রাখি।

মিছুটান

যে যায়, সে যায় ;
যে থাকে, সে টেনেবুনে পাঁচ-দশ বছর আরও থাকে।
সেও যেত, কিন্তু তার রয়েছে বেজায়
পিছুটান, কেউ-কেউ রহস্য করে যাকে
বলে মিছুটান।

সে ডাকে, "ও বড়োবউ, শেষকালে যে দফতরে গর্দান
কাটা পড়বে, ভাজাভুজি-চচ্চড়ি যা হয়
তা-ই দিয়েই খেতে দাও, আটটা বাজে, কালকে হয়েছিল
বড্ড দেরি, আজ যেন না হয়।"

কালকে সে সমস্ত রাস্তা ভয়ে-ভয়ে ছিল।

সে খুব দুঃখিত নয়, সে খুব সুখীও নয়। তার একদিকে
বড়োবউ, অন্যদিকে বড়োবাবু। মধ্যিখানে ক্রমাগত দেরি
করতে-করতে প্রাণ-ভ্রমরা আছে তা'র টিঁকে !

পাঁচ-দশ বছর আরও মাঝেমধ্যে বলবে সে, "ধেত্তেরি !"

ঘুরে দাঁড়ালেই

আমি যখনই ঘুরে দাঁড়াই,
তখনই দেখি যে,
পশ্চিমের আকাশ যতই মেঘে-মেঘে থমথম করুক,
পুবের আকাশ ফরসা।
সেখানে
হাওয়ার দাঁত বসিয়ে মেঘের জাল কেটে
বেরিয়ে এসেছে রোদ্দুর।
আকাশ আবার ঝলমল করে উঠেছে।

আমি যখনই ঘুরে দাঁড়াই,
তখনই দেখি যে,
সমস্ত ভয় ছত্রখান হয়ে গিয়েছে।
সূর্যের চারদিকে তখন আর মেঘ ঘুরঘুর করে না,
আকাশটারও বুক দুড়দুড় করে না।
রোদ্দুর তখন
নগ্ন ও সাহসী একখানা তলোয়ারের মতো
ঝলমল করে ওঠে।

চোখ না-তুলেও

কে কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে,
তোমরা দেখতে যেও না।
শুধু, কে কী বলছে, শোনো।

এখানে খানা, ওখানে খন্দ ;
তার মধ্যে, রাত্তিরে তো বৃষ্টি হয়েছিল, জল জমেছে
জলের উপরে খেলে যাচ্ছে নীলচে একটা আভা।

এখন আর উপরে চোখ তুলবার দরকার করে না,
জলের দিকে তাকিয়েই তোমরা বলতে পারো যে,
আকাশটা আজ নীল।

আমি যেখান থেকেই কথা বলি না কেন,
উপরের দিকে চোখ না-তুলেও
ওই
নীল আকাশের কথাই আমি বলব।

তার মুখশ্রী

গিঁটগুলোকে খুলতে-খুলতে
তার মুখশ্রী ভুলতে-ভুলতে
এখন হেঁটে যাওয়া ;
পথের পাশের গাছপালাকে
কাঁপিয়ে দিয়ে বইতে থাকে
বাদল-দিনের হাওয়া।
হঠাৎ কালোর মধ্যে, একী,
উপচে-উপচে পড়ছে দেখি
ভেঙে মেঘের সীমা
জ্যোৎস্নাধারা, ঝড়বাদলেও
জানলা খুলে দাঁড়ায় কে ও ?
পূর্ণিমা ! পূর্ণিমা !

রোদ্দুরে ও মেঘে

ভাল লাগবে বলেই বারবার ছুটে আসি।
অথচ লাগে না, তাই
ফিরে যাই।
এই যে উৎকণ্ঠা, এই ছুটে আসা, ভালবাসাবাসি,
এ কি তবে মিথ্যে, এ কি মায়া ?

আকাশে জমেছে মেঘ, মাঠের উপরে তারই ছায়া
শুয়ে আছে।
অনেক দূরে ও খুব কাছে
আজ খুব শান্তভাবে কথা-চালাচালি হয়ে যায়।
হাওয়ায় হাওয়ায়
ভাসে তার একটুখানি রেশ।

খুব নির্বিশেষ
এই মেঘাচ্ছন্ন দিন, এই যাওয়া-আসা,
রোদ্দুরে ও মেঘে কিংবা হাওয়ার ভিতরে
মৃদু স্বরে
এই দীর্ঘ আলাপন, এই ভালবাসা।

স্বপ্ন নয়

উত্তুরে হাওয়ার ধারালো দাঁতের কামড় খেতে-খেতে বলি,
আর মাত্র কয়েকটা দিন,
তারপরেই হাওয়া ঘুরবে,
ফুল ফুটবে, পাখি ডাকবে, মিশকালো কম্বলগুলোকে
ঠেলে ফেলে দিয়ে
আবার আমরা টান হয়ে দাঁড়াব।

মেঘে-ঢাকা আকাশের দিকে চোখ রেখে বলি,
আর মাত্র কয়েকটা দিন,
তারপরেই এই মেঘ কেটে যাবে,
আকাশ নীল হবে, সূর্য উঠবে, ঘাসের উপরে
অভ্রের কুচির মতো
ঝিকিয়ে উঠবে রোদ্দুর।

মানুষ তো স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এগুলি স্বপ্ন নয়।
বীজের অন্ধকারকে ফাটিয়েই যে
বৃক্ষ জেগে ওঠে, আমরা জানি।

এখন রাত্রি

রাত্রিকে ভয় পেও না,
রাত্রির গর্ভের মধ্যেই যে
ফুটফুটে একটা সকাল ধীরে-ধীরে
তৈরী হয়ে ওঠে,
এই সহজ কথাটা মনে রেখো।

এখন রাত্রি।
এখন অন্ধকার।
কালো-কালো পাথুরে দেওয়ালে
চোখ এখন আটকে যাচ্ছে।

তবু ভয়ের কিছু নেই।
মনে রেখো,
এমন কোনও রাত্রি কখনও আসেনি,
যার পরেই
সুন্দর একটা সকাল ছিল না।

যখন কুয়াশা

রাত্তিরে খুব কুয়াশা জমেছিল।
সাত-সকালেও কপালে আলো জ্বেলে
পা টিপে-টিপে এগোচ্ছে
মস্ত-মস্ত ট্রাক।
বিমানবন্দরের লাউডস্পীকারে বারবার বলা হচ্ছে :
কুয়াশা না-কাটা পর্যন্ত কোনও প্লেনই
আকাশে উঠবে না।

পাশের ভদ্রলোক বলেন, "ধুৎ,
বড্ড দেরি হয়ে গেল।"

কিসের দেরি, কিংবা কতটা,
তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না,
কেননা,
আমার কোথাও যাবার নেই।
যে যাবে,
আমি তাকে বিদায় জানাতে এসেছিলুম।

আমি তার হাতখানাকে আমার হাতের মধ্যে টেনে নিই
তারপর, যেন কোনও গুপ্তমন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি
এইভাবে বলি,
"সব কুয়াশাই শেষপর্যন্ত কেটে যায়।
এই কুয়াশাও কাটবে,
তুমি দেখো।"

খেলা

হাতে একটা রুহিতন থাকা সত্ত্বেও
অম্লানবদনে আমার
রুহিতনের টেক্কাটাকে তুমি তুরুপ করেছ।

তোমার আঙুলের কৌশলে
আমার হাতে যখন
নয়, গোলাম আর সাহেব আসে,
তখন তোমার হাতে যায় দশ, বিবি আর টেক্কা।

তা ছাড়া,
ইস্কাবনের খেলায়
মোট নটা পিট পেয়েও তুমি
সাতাশের বদলে ছত্রিশ লিখেছিলে।

তুমি অনেক-কিছু জানো।
শুধু, আমার বাঁ-দিকে বসেও তুমি
ধরতে পারোনি যে,
আমার দু-চোখে দুটো আয়না বসানো আছে।
তুমি জানো না যে,
আমার পাল্‌টা-মার শুরু হতে আর
দেরি নেই।

চিল

যিনি আমার চাইতে বড়, তাঁকেই
ঢিল ছুড়েছি আমি।
একটু হীনম্মন্যতা তো থাকেই,
সেই কারণেই অতর্কিতে হচ্ছে ঊর্ধ্বগামী
হাতের থেকে ঢিল,
সেই কারণেই বিস্তারিত ধুলোয় দেহ রাখেন
স্থিতপ্রজ্ঞ গভীর শঙ্খচিল।

তিনি আমার চাইতে বড়, অনেক বড়, দূর
ঊর্ধ্বাকাশে হাওয়ার
মধ্যে তিনি রেখেছিলেন বিষণ্ণ-বিধুর
শব্দে-ধরা গতির চিত্র। আমরা ভূতে-পাওয়া
দুপুর জুড়ে ঢিল
কুড়িয়েছিলুম। সেই কারণেই তাঁর চূড়ান্ত যাওয়ার
চিত্র এঁকে রাখেন শঙ্খচিল।

সে কি পাখি ?

এক্ষুনি এইখানে ছিল, এক্ষুনি আকাশে,
গ্যাখো কী আনন্দে পাখি ভাসে
মেঘের জানলায়।

যেই ডেকেছি, আয়,
অমনি সে আকাশ থেকে ধরা দিতে আসে
ব্যগ্র বাহুপাশে।

এক্ষুনি উড়িয়ে দিয়ে এক্ষুনি আবার যাকে ডাকি,
সে কি পাখি, সে কি শুধু পাখি ?

কুশে ও মানুষে

কুশের ভিতরে ছিল কুশ,
পায়ে যা ফুটেছে বারো মাস,
ঘাসের ভিতরে ছিল ঘাস,
মানুষের ভিতরে মানুষ।

যে-রকম নদীর ভিতরে
মেলেনি নদীর কোনো সীমা,
যে-রকম নীলিমার ঘরে
শুয়ে ছিল দ্বিতীয় নীলিমা।

তেমন করেই কিছু ফুল
ফুলের ভিতরে থেকে যায়,
পুতুলের ভিতরে পুতুল
জেগে ওঠে বিকেলবেলায়।

তুমি কাকে ব্যথা দিয়েছিলে ?
আমাকে, না আমারই আড়াল
মিটিয়ে যে হলুদ বিকেলে
বিদায় নিয়েছে গতকাল ?

ব্যথাই বা কে দিয়েছে ? সে কি
তুমি ? নাকি কুশে ছিল কুশ,
মানুষের ভিতরে মানুষ ?
তাই দেখি, সারাদিন দেখি।

কালো পালক

এইরকমই হয়!
ধান ছড়ালে ধান হয় না, ভাত ছড়ালে কাকের চিৎকারে
কলকাতার চট্‌কা ভেঙে যায়।
হাজার মিশকালো ডানা আকাশে, উঠোনে, বারান্দায়
মুহুর্মুহু ঝাপ্‌টা মারে।
যাকে লক্ষ্য বলে জানো, অকস্মাৎ তারই পরাজয়
স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এখনো বিকেল হয়নি, তিনটে বাজে মোটে।
এখনো রোদ্দুর
ঝলসাচ্ছে রাস্তায়, একটি দুর্দান্ত ভিখারী
কড়া নেড়ে ভিক্ষা চাইছে পাশের বাড়িতে।

ভিক্ষার কি এইখানে ঘরবাড়ি ?
ভিক্ষা থাকে দূর
মফস্বলে, গাঁয়ে, তাই তুমি তো পারো না ভিক্ষা দিতে।
বরং যেজন্যে তুমি নিজেও সমূহ কাড়াকাড়ি
করে থাকো, তা-ই দাও, একটি-দুটি পয়সা ফেলে দাও।

যা দেবে নিঃশব্দে দিও, যাতে না হাওয়াও
কিছু বুঝতে পারে ; তারপরে
ফিরে এসো ঘরে।
এসে দ্যাখো, বালিশের কাছে
দু-চারটে রহস্যময় মিশকালো পালক পড়ে আছে।

ভাষায়, ভালবাসায়

ভাষার মধ্যে ভাষা, এবং পুনশ্চ সেই ভাষার
মধ্যে বেগ্‌নীবর্ণ ভালবাসা
জ্বলতে থাকবে, যেমন জ্বলে সুখের মধ্যে সুখ।

একটা পাখির ভিতরদেশে আর-একটা উৎসুক
স্ফটিকজলের জন্যে। তুমি জলের মধ্যে জল
খুঁজতে-খুঁজতে উড়িয়ে দিচ্ছ যা ছিল সম্বল।

ভাষার মধ্যে ভাষা, এবং পুনশ্চ সেই ভাষার
মধ্যে বেগ্‌নীবর্ণ ভালবাসা…

এই তো তুমি সন্ধ্যাবেলার চত্বরে পা ফেলে
অনেক ঘুরে এলে।
এখন বলো, সন্ধ্যাবেলার রক্তে কি একতিলও
অন্য-কোনও রক্ত মিশে ছিল ?

ভাষার মধ্যে ভাষা, এবং পুনশ্চ সেই ভাষা…

একটা ছিল ওষ্ঠে তোমার, একটা ছিল বুকে,
সেই দুটোকে মিলিয়ে নিলেই হিসেবটা যায় চুকে
ভাষার। যদি ভাষা
নিজের রক্তে জ্বালায় বেগ্‌নীবর্ণ ভালবাসা।

ঢেঁকি

বিশাল ঢেঁকির মতো উত্থাপিত হয়েছে বোয়িং
স্বর্গের উদ্যানে। সদ্য-লব্ধ ঠিকানায়
বাতাসে ঝড়ের শব্দ বাজে তার বিস্তৃত ডানায়।
লাল
চক্ষু দেখে শিং
নেড়ে এসেছিল বটে কিউমুলাস মেঘের বাচ্চারা,
কিন্তু বেগতিক দেখে দু-চারটে অস্ফুট গালাগাল
দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে তারা।

বিশাল ঢেঁকির মতো স্বর্গে গিয়ে ঢুকেছে বোয়িং,
ফটাফট খুলে যাচ্ছে খাদ্যের আলমারি,
তৎসহ বাহারী
নানাবর্ণ বোতল। অন্যার্থ এই যে, স্বর্গের বাগানে
ঢেঁকি তা-ই করে, যা সে মর্ত্যেও করেছে চিরদিন,
একাগ্র চিত্তে সে ধান ভানে।

জাহাজী কবিতা

মাঝে-মাঝে মনে হয়, রক্তের ভিতরে আর ঝাঁকি নেই।
তাই বলে কি বাকী নেই
কোনো কাজ?
সভাকক্ষে গিয়ে কি পরাস্ত কণ্ঠে বলব, "মহারাজ,
বিস্তর উদ্যম, ঘর্ম এবং সময়
দিয়েছি আপনাকে, আর নয়,
এইবারে সম্যক্ ছুটি দিয়ে দিন" ?

ময়দানের বিশাল মিটিং
ফুঁড়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায় সুন্দর সুঠাম ছায়াতরু,
গাছতলায় চাঁদকপালী গোরু
ঘাস খায়। কিচিকিচি
তিনটে-চারটে-পাঁচটা-ছটা চড়ুইয়ের ঝগড়া চলে মিছিমিছি
অশ্বত্থের জানালায়
আলো এসে ছায়াকে ডাক দিয়ে দূরে সরে যায়।
তা ছাড়া কোথাও কোনো ডাকাডাকি নেই।

রক্তের ভিতরে আর ঝাঁকি নেই।
কিংবা আছে। যে-লোকটা রাত্তিরে তারা গোনে,
তার দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে গোপনে-গোপনে
ধুলার ভিতরে
হাটেমাঠে, গ্রীষ্মে ও বর্ষায়, খোড়োঘরে
যে-রকম।

একদিকে বিশ্রাম নিচ্ছি, সেরে উঠছে সমস্ত জখম,
অন্যদিকে
যা যা দেখছি, চিত্তে সবই রাখছি লিখে,
ডাক্তার সম্মত হেসে মাথা নাড়ছে,

সে জানে, বর্ষার জলে নদীর নাব্যতা বাড়ছে,
খলখল
হাততালি বাজিয়ে ছুটছে জল,
বিশ্রামের অবসরে তৈরী হচ্ছে কাজ।

মহারাজ,
জ্ঞাতার্থে জানাই, রক্তে ঝাঁকি মেরে আবার জাহাজ
জলে নামবে। আজ না হোক তো কাল
ডেকের উপরে তার উড়তে থাকবে অজস্র রুমাল,
ঘণ্টা বাজবে ঢংঢং।

হাসপাতালে আজকে তার আমূল ফেরানো হচ্ছে রঙ

হারানো ছেলে

"কোঁকড়া চুল, ময়লা রঙ, রোগা,
ডান ভুরুর আধ ইঞ্চি উপরে একটা তিল,
থুতনির নীচে কাটা দাগ…"
ভাঁজ-করা কাগজ থেকে মুখ তুলে ভদ্রলোক বলেন,
"বিজ্ঞাপনটা আপনারই তো ?"

আমি ঘাড় নাড়তেই তিনি হাততালি দেন,
আর তখুনি
পর্দার আড়াল থেকে একটি ছেলে আমার
সামনে এসে দাঁড়ায়।
ভদ্রলোক বলেন, "দেখুন মশাই,
চিনতে পারেন কিনা।"

আমি দেখি।
এবং আমি চিনবার চেষ্টা করি।
কোঁকড়া চুল, ময়লা রঙ, রোগা,
ডান ভুরুর আধ ইঞ্চি উপরে একটা তিল,
থুতনির নীচে কাটা দাগ।

কোথাও কোনো অমিল নেই।
শুধু চাউনি ছাড়া।
ডাগর, ভীরু ও লাজুক চোখের যে ছেলেটি হঠাৎ একদিন
হারিয়ে গিয়েছিল,
গত তিন মাসে তার দৃষ্টি আমূল
বদলে গিয়েছে।

আমি তার চোখের উপর থেকে
চোখ সরিয়ে নিই ;

কিন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে থেকেও আমি বুঝতে পারি যে,
আমার দেখা শেষ হবার পরে সে এখন তার
খর তীব্র চক্ষু দিয়ে
আপাদমস্তক আমাকে দেখে নিচ্ছে।

আমি তাকে চিনতে পারি না।

একটি-দুটি

মানুষ দুটি-একটি মাত্র,
অন্যেরা তো চরে বেড়ায়,
চতুর্দিকে দিবসরাত্র
হাম্বা-হাম্বা ডাক শোনা যায়,
লম্বা দড়ির প্রান্তে দেখছি শক্ত খুটি।
মানুষ মাত্র একটি-দুটি।

ওই কবি তরঙ্গ ছিঁড়ে
অগাধ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে,
অন্যেরা সব দাঁড়িয়ে তীরে
পরের পকেট হাল্‌কা করছে।
চতুর্দিকে হাজার-হাজার ভণ্ড-ঝুটো,
কবি মাত্র একটা-দুটো।

তুমি দ্যাখো

একদা যেখানে ছিলে, সেইখানেই আছো,
ঠিক ততটা উঁচুতে, মেঘের
জানালায়।
অন্য অনেকেই কিন্তু ইতিমধ্যে স্থানচ্যুত, বেগে
হাওয়া বইলে খসে পড়ে যায়।
বাঁচে না অনেকে।
তুমি বাঁচো।
তুমি দ্যাখো, বেগনী ও লোহিতে আঁকা গোধূলিবেলায়
কে কোথায় কতটুকু চিহ্ন যায় রেখে।

অন্য রকম

ঠিক তোমার মতো মানুষ আমি কোথায় পাব ?
যদি চাও, তাহলে
তোমার চেয়ে আর-একটু ভাল
কিংবা
আর-একটু মন্দ একটা
মানুষ তোমাকে দিতে পারি।

আমাদের এখানে ফাল্গুন খুব সুন্দর গিয়েছিল,
যেমন তোমাদের ওখানে যায়।
চৈত্রে ফেটেছিল মাটি,
যেমন তোমাদের ওখানে ফাটে।
বৈশাখের মাঠে
পলাশে শিরীষে আর কৃষ্ণচূড়ায়
ঠিক সেই রকমের আগুন আমরা জ্বলতে দেখেছি,
যেমন তোমরা ছাখো।

আমরা জানি যে, আমাদের জ্যৈষ্ঠও ঠিক সেই রকমের হবে,
যেমন তোমাদের হয়।

আসলে, তোমাদের আর আমাদের,
মাটি জল আর হাওয়া একেবারে
একই রকম।
শুধু মানুষগুলোই একটু আলাদা।

ঠিক তোমার মতো মানুষ আমি কোথায় পাব ?

যা চাও,
তার চেয়ে একটু অন্য রকমের নাও। আর-একটু

1

ভাল, কিংবা
আর-একটু মন্দ ;
আর-একটু স্পষ্ট, কিংবা
আর-একটু আবছা একটা
মানুষ তোমাকে পাঠিয়ে দিতে পারি।
আমি আমাকেই দিতে পারি। তুমি নেবে ?

শব্দহীনতার ভিড়ে

কে থাকে বিরহে ? তুমি থাকো।
তুমি ভালবাসা।
যদিও তোমার মুখে ভাষা
আজ নেই।

তত-কিছু সাজ নেই, হাওয়ার ভিতরে খুবই আলগোছে ভাসিয়ে তুমি রাখো
তোমার শরীর।

এই শব্দহীনতার ভিড়
ঠেলে, সাধ হয়, যাই, তোমার নিকটে গিয়ে চাবি
চেয়ে আনি প্রাসাদের, পরক্ষণে ভাবি,
কাজ নেই।

সানাই

ভিতরে-ভিতরে যেন কার
রাগ ছিল, তাই
হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে উঠল দূরের পাহাড়।

এইখানে ম্যারাপ-বাঁধা বাড়িতে সানাই
বেজে যাচ্ছে, দূরে
অগ্নি জ্বলছে লেলিহান, পাহাড়ের বুক যাচ্ছে পুড়ে।

এই যেমন

কেমন আছেন, দাদা ?
এই তিনি যেমন রেখেছেন।
উত্তর শুনেই বুঝি, বিনাবাক্যে নানাবিধ দৃশ্য দেখেছেন
ভদ্রলোক।
ঝড়বাদলে শুকনো মাটি কাদা
হয়, সাদা ঝক্‌ঝকে বাড়িতে কালো শোক
নেমে আসে,
ধোপদুরস্ত জুঁইলতার পাশে
কার্নিস ফাটিয়ে হাসে অশ্বত্থের চারা

কালকেও এখানে জোর জলসা জমেছিল,
আজ নিঝুম পাড়া।
দেখে মনে হচ্ছে যেন মাংস দম্‌-এ ছিল
প্রেশার কুকারে, দিব্যি শোঁশোঁ
উঠছিল আওয়াজ,
কিন্তু কী যে কাণ্ড, সব হিসেবী আন্দাজ
ফাঁসিয়ে ইষ্টিম গেছে ঝুলে।
রোসো,
তুলনা মুলতুবী রেখে বলি যে, ঘরের দরজা খুলে
কেউ সহসা নামছে না রাস্তায়।

অবশ্য জানলায় গিয়ে উঁকি দেওয়া যায়।
কিন্তু তাতে কিছুমাত্র লাভ তো নেই-ই, বরং বিস্তর
ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা। যার
লক্ষ্য শুধু আত্মরক্ষা, সেই হতভাগার
পেটে বোমা মারলে বড়জোর
'আঁক' করে আওয়াজ হবে, কিন্তু কোনো বাক্য বেরুবে না

অবস্থাটা বুঝবে বলো কে না।
ইনিও বোঝেন, তাই
‘কেমন আছেন, দাদা’ জিজ্ঞেস করলেই অমনি হাই
তুলে, তুড়ি দিয়ে, শীর্ণ ঘাড়টাকে বাঁকিয়ে
আকাশে তাকিয়ে
কন, “তিনি যেমন রেখেছেন।”

সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু
শুনে বুঝি, বুড়ো একটি বাস্তুঘুঘু,
মন্তব্য না করে শুধু নানাবিধ দৃশ্য দেখেছেন

ঘরবাড়ি ও অজস্র ঘটনা

দৌড়তে দৌড়তে দিন যায়,
অতর্কিতে রাত্রি নেমে আসে,
তারপরে সে যেতে চায় না আর

কবে যেন সকালবেলায়
দেখেছিলি কার নয়নে ভাসে
উন্মীলিত পদ্মের বাহার।

সে কি গতকল্যের, না গত-
জন্মের স্মৃতির একটি কণা ?
প্রশ্ন করে বিষণ্ণ সানাই।

সামনে রাত্রি, পিছনে নিহত
ঘরবাড়ি ও অজস্র ঘটনা,
অথ তারই বুঝে নিতে চাই।

ডাক পড়েনি

একটা লোক মাঠের মধ্যে খাটছে সারাবেলা,
একটা লোক কুড়িয়ে আনছে ধান,
একটা লোক পুতুল নিয়ে গেছে দূরের মেলায়,
একটা লোকের চিত্তে জ্বলছে ভীষণ অভিমান।

কেননা তার ডাক পড়েনি মেলায় কিংবা মাঠে।
কেননা তার একলা-একলা কাটছে ঘণ্টাগুলো।
সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে পা রেখে চৌকাঠে
দেখছে, শুকনো বাতাস ওড়ায় ধুলো।

একদিন এইসব হবে, তাই

একদিন সমস্ত যোদ্ধা বিষণ্ন হবার মন্ত্র শিখে যাবে।
একদিন সমস্ত বৃদ্ধ দুঃখহীন বলতে পারবে, যাই।
একদিন সমস্ত ঘর্ম অর্থ পাবে ভিন্ন রকমের।
একদিন সমস্ত শিল্পী কল্পনার প্রতিমা বানাবে।
একদিন সমস্ত নারী চোখের ইঙ্গিতে বলবে, এসো।
একদিন সমস্ত ধর্মযাজকের উর্দি কেড়ে নিয়ে
নিষ্পাপ বালক বলবে, হাহা।
একদিন এইসব হবে বলেই এখনও
সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, এবং কবিতা লেখা হয়।